Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501049 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Artistic Technique in Alauddin Al-Azad's Short Stories
আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটোগল্প: শিল্প প্রকরণ

Dr. Eahea Mannan
Associate Professor
Bengali Department
National University, Bangladesh

Received on: 15th May 2026
Accepted on: 29th May 2026

Abstract:
This essay analyzes the artistic vision and technical mastery of Alauddin Al Azad (1932–2009), a pivotal figure in post-partition Bengali fiction. Azad's work is characterized by a deep commitment to social realism, blending sensory truth with intellectual rigor to reflect the history, politics, and culture of his time.

The analysis highlights Azad's diverse thematic range — from early depictions of class struggle and rural exploitation to the harrowing realities and psychological aftermath of the Liberation War. His characterization is noted for its "root-connectedness," transforming marginalized figures — laborers, revolutionaries, and even animals — into vivid, multi-dimensional beings. Furthermore, the essay examines his narrative techniques, specifically his expert use of omniscient third-person and first-person perspectives, as well as flashback methods, to create a unique and enduring literary style.

His story variety, character creation, narrator's point of view, skill in using native and foreign words, use of punctuation marks, skillful use of rhetoric, use of poetic language, sentence structure, fluent use of proverbs and idioms, reciprocity of nature and human spirit, and realistic use of dialogue are all undeniable in creating a unique identity and scope in fiction during a turbulent post-partition era.

Key Words:
Five senses, interaction, tendency, perspective, figure of speech, poetic language, proverbs and sayings, idioms, experiential, artistic style

মূল প্রবন্ধ

সাহিত্য রচনার শুরু থেকেই শিল্পী ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা উভয়কে একবিন্দুতে একীভূত করে আলাউদ্দিন আল আজাদের এগিয়ে চলা। শিল্পীর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে শিল্প অথবা শিল্পমানকে ক্ষুণ্ণ করে শিল্পীর ব্যক্তিগত আবেগকে গল্পে আরোপ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন ছিলেন না। তাঁর ছোটোগল্পের বাস্তবতা হলো লেখকের পঞ্চেন্দ্রীয় দ্বারা অনুভব করা সত্যের সঙ্গে মেধা ও মননের মিথস্ক্রিয়ায় প্রাপ্ত নির্যাস। যুগের ইতিহাস, প্রকৃতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও প্রবণতা সবই লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে

© Santiniketan Sahityapath

এবং গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে আধেয়কে ধারণ করার উপযুক্ত ভাষারীতিও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর সাহিত্য সমালোচনা ইতিবৃত্ত ও পরিপ্রেক্ষিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '… বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সামঞ্জস্য বিধানই প্রত্যেক শিল্পকর্মের মূল প্রক্রিয়া। এটা নতুন কিছু নয়, ভারতীয় চিন্তায় যেমন ছিল তেমনি গ্রীকেও।'[১] কাহিনি বৈচিত্র্য, চরিত্র সৃজন, কথকের দৃষ্টিকোণ, দেশি বিদেশি শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, বিরতি চিহ্নের ব্যবহার, অলঙ্কার ব্যবহারে মুনশিয়ানা, কাব্যিক ভাষা ব্যবহার, বাক্য গঠন, প্রবাদ — প্রবচন ও বাগ্‌ধারার সাবলীল প্রয়োগ, প্রকৃতি ও মানবাত্মার পারস্পরিকতা, সংলাপের বাস্তবানুগ প্রয়োগ সার্বিকভাবে দেশবিভাগোত্তর অস্থির এক সময়ে কথাসাহিত্যে স্বকীয় পরিচয় ও বলয় সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আজাদের শিল্পশৈলী সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য: বাংলা কথাশিল্পের বাস্তবতা—নিবিড় বিষয় — বৈচিত্র্যের বাইরে আলাউদ্দিন আল আজাদের শিল্পচেতনার যে অতিরিক্ত বিশেষত্ব ধরা পড়ে তার পরিচয় রয়েছে তাঁর ভাষার কাব্যময়তায়, বর্ণনার শিল্পিত মাধুর্যে ও বাক্যবিন্যাসের চমৎকারিত্বে, যার সমন্বয়ে অনায়াসে গড়ে উঠেছে তাঁর রচনার অনন্য এক শিল্পশৈলী।[২]

আলাউদ্দিন আল আজাদ একাধারে সমাজ, রাজনীতি, যুগ, প্রকৃতি সর্বোপরি আত্মসচেতন একজন লেখক। সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কিত লেখকের অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা ও দর্শন গল্পগুলিতে ধারাবাহিকভাবে পরিণতি লাভ করেছে। গল্পের কাহিনি ও চরিত্রের যে গভীরতা উত্তরোত্তর তার বিবর্তন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আলাউদ্দিন আল আজাদের মৌলিক ছোটোগল্পগ্রন্থের সংখ্যা আটটি। তাঁর ছোটোগল্পের কাহিনি গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। লেখকের গল্পের ক্যানভাস খুব বিস্তৃত না হলেও মূল কাহিনির পাশাপাশি শাখা কাহিনিও বেশ কিছু গল্পে রয়েছে। লেখকের প্রথম জীবনে গল্পের কাহিনিতে শ্রেণিসংগ্রাম মনোযোগের বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', 'মৃগনাভি' গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পে শোষণের বিরুদ্ধে বিত্তহীন শোষিত শ্রেণির প্রতিবাদ কাহিনির মূল ফোকাস। তবে লক্ষযোগ্য যে এই গল্পগুলির মাঝে লেখকের কৈশোরে অভিজ্ঞতালব্ধ দাঙ্গা ও আকাল বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। পরবর্তী সময় মুক্তিযুদ্ধ লেখকের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে গল্পে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'আমার রক্ত স্বপ্ন আমার' ও 'জীবন জমিন' গ্রন্থে লেখকের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ করা ভয়াবহতা, নৃশংসতা, রাজাকারদের ভূমিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ পরিণতি ও রাজাকারদের খোলস পাল্টে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবমূল্যায়ন বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক গ্রামীণ জীবনকে গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে প্রথমদিকে অধিক গুরুত্ব দিলেও শহরকেন্দ্রিকতা ধীরে ধীরে গল্পের কাঠামোতে প্রবেশ করে এবং বিস্তার লাভ করে। শহরের উচ্চবিত্তদের নৈতিক অবক্ষয় কিছু গল্পে স্থান পেলেও প্রধানত বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তদের নানামুখী জীবন যন্ত্রণার রূপায়ণ তাঁর চেতনায় সক্রিয় ছিল। শোষণহীন সমাজের আকাক্ষা, অর্থনৈতিক দুর্দশা, প্রেমের বহুমাত্রিকতা, যৌনতা, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, শহর জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মানবিকতার অবক্ষয়, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাজনীতির মোড়কে স্বার্থনীতি সবকিছুই তাঁর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এবং গল্পের কাহিনিতে বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে।

চরিত্র চিত্রণে তিনি শেকড় সংলগ্নতায় আস্থাশীল। গ্রামের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ তাদের অস্থিচর্ম সর্বস্ব অবয়ব নিয়ে বারবার হাজির হয়েছে, সমাজের গভীর সমস্যাকে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। শ্রমজীবী এই চরিত্ররা লেখকের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[৩] তাদের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহানুভূতিতে তারা নিরাবেগ জড় চরিত্রের পরিবর্তে রক্ত মাংসের মানুষে পরিণত হয়েছে। নারী চরিত্র, শিশু চরিত্র, আদিবাসী চরিত্র-সহ শহরের অভিজাত শ্রেণি সব ধরণের চরিত্র তাঁর আন্তরিক ছোঁয়ায় স্ব-শ্রেণির যথার্থ প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে তিনি প্রতিবাদী চরিত্র রূপায়ণে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নানামুখী সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, পরিণতি, তাদের পরিবারের যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা, রাজাকারদের ভূমিকা ও অবস্থান বিষয়গুলি অনেক গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন। যেমন 'আমাকে একটি ফুল দাও' গল্পের ওমর, 'স্বপ্ন আমার' গল্পের লে. মফিজ, 'চাষাভুষা' গল্পের তমিজ, 'মুক্তিযোদ্ধা' গল্পের মোজাহার চরিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অপরিসীম দরদ প্রকাশিত হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর গল্প বয়ন কৌশলের অভিনবত্ব অনুধাবন করা যায়। গল্পের কাহিনি বর্ণনার জন্য তিনি প্রচলিত দুটি পদ্ধতির অনুশীলন করেছেন। যথা:

ক. গল্পকারের (Third Person) দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনারীতি।

খ. উত্তম পুরুষের (First Person) দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনারীতি।

গল্পকার যখন গল্পের কাহিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বর্ণনা করেন তখন সেই বর্ণনা পদ্ধতিকে গল্পকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনারীতি বলা হয়। এ ধরণের বর্ণনারীতিকে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণও বলা হয়ে থাকে। এ ধরণের গল্পে বর্ণনাকারী হিসেবে উত্তম পুরুষ 'আমি'র উপস্থিতি থাকে না তবে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে 'আমি'র প্রয়োগ থাকতে পারে। এখানে এক বা একাধিক চরিত্রের নাম থাকতে পারে আবার না — ও থাকতে পারে। তবে এ ধরণের গল্পের মূল নিয়ন্ত্রক গল্পকার স্বয়ং। আলাউদ্দিন আল আজাদ এই রীতির গল্প লিখেছেন সর্বাধিক। উদাহরণ:

তারা চারজন। একজন বেঁটে, গাট্টাগোট্টা। একজন মাঝারি, আর বাকি দু'জন প্রায় সমান লম্বা। লম্বা সমান হলেও বুকটা যার চওড়া, আর কাঁধ দু'টো, ভারী, দবজ হাতজোড়া, নাকের নীচে পাকানো মোচ, তার নাম ইব্রাহীম, ডাকনাম ইবু, সে ইবু গুণ্ডা নামেই পরিচিত। সেই সর্দার। দল এটা নয়, তবু সর্দার, তার মানে হলো, চারজন এক সঙ্গে হলে ওর কথাই মেনে চলতে বাকী তিনজনা রাজী। বেঁটে জব্বর, মানে জবু ভয়ানক ক্ষিপ্র, গোলগাল বকনা বাছুরের মতো, দরকার হলে গুলীর মতো ছুটতে পারে। মাঝারি মালেক, মানে মানু, নিমচোট্টা; কথাবাতার্ বড় একটা বলে না, একটা নিরীহ শান্তভাব; কিন্তু কোনোক্রমে রাগলে একবারে দিশেহারা হয়ে যাওয়াই ওর অভ্যেস। আর লম্বা — সম্বা কালু নির্ভেজাল গোঁয়ার — গোবিন্দ।[৪]

অপর একটি গল্প 'চিহ্ন', 'আদালত গালে হাত দিয়ে বসে ওর খাওয়া দেখছিল।... আরেকটা মরিচ ভেঙে মাখতে মাখতে কামু জিগ্গেস করল, তর আছে তো?'[৫] বর্ণনাংশে আদালত ও কামু নামক একজন নারী ও একজন পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বর্ণনা করছে এই দুইজনের বাইরে অন্য কেউ অর্থাৎ গল্পকার নিজে কথকের ভূমিকায় রয়েছেন। উদ্ধৃতাংশে একটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে ঘটনা ও পারিপার্শিক প্রতিবেশ সামগ্রিক অবলোকনের বা সর্বদ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। এই রকম বর্ণনা পদ্ধতি অন্যান্য গল্পেও প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে গল্পকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনারীতি গল্পে সংলাপের ক্ষেত্রে 'আমি' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। 'শিকড়', 'কয়েকটি কমলালেবু', 'সৃষ্টি', 'মুখোমুখি' গল্পগুলি সর্বজ্ঞদৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

গল্পকার যখন কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের দৃষ্টিকোণ বা অভিজ্ঞতার আলোকে পুরো কাহিনি বর্ণনা করেন তখন তাকে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনারীতি বলা হয়। এই বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষ 'আমি'র উপস্থিতি অনিবার্য এবং তার মাধ্যমেই গল্প বিবৃত হয়। উদাহরণ:

১. হঠাৎ করে রত্নাকে আমি এমন ভালোবেসে ফেলবো তা আমার ধারণার মধ্যেও ছিল না।[৬]

২. আমি আমি কাপুরুষ, তুমি দয়াবতী। আমি কাপুরুষকে তুমি দয়াবতী সেদিন যখন সন্ধ্যায় শ্রাবণের ঝম্ ঝম্ হঠাৎ — বৃষ্টির পরে এক সঙ্গে ট্রাফিকের আওয়াজ উঠল, আমাকে পুনরায় দয়া করে গেলে।[৭]

উদাহরণ দুইটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে গল্পের চরিত্রসমূহের মধ্য থেকেই একটি চরিত্র কথকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেই কথক চরিত্রটি তার দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বর্ণনা করছে। নিম্নে আরো একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

অবশ্য খুব আদর করি আমি তুফানীকে খুব যখন সে আমার ভিতরে নামে ওর ডগমগে পেলব গতরে ঠেলা দিতে আঘাত করতে বড় ভালো লাগে। ওর দেহ ঘিরে হর্ষের হাজার আয়না হয়ে নাচতে থাকে ঘুরতে থাকে ঢেউ আমার প্রবাহ এবং যখন সাঁতার কাটে আমি আন্দোলিত হতে থাকি, কেন জানি না ওর অঙ্গসঞ্চালন ভিতরে আমার নিদারুণ ঝড় তোলে। মনে হয় বুঝিবা এক্ষুণি একটি প্রচণ্ড মোচড়ে জলস্তম্ভ হয়ে অনেক উপরে উঠে যাবো আর ওকে সম্মোহিত হয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে খেলবো দানবের মতো। আমি ব্রহ্মপুত্র মানসসরোবর থেকে এত দূরে এসে যেন উৎস হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু যখনই এমন মুহূর্ত মনে হয় যৌবন ফিরে পেলাম।[৮]

© Santiniketan Sahityapath

উত্তম পুরুষে বর্ণনা হলেও এখানে অভিনবত্ব রয়েছে। গল্প কথককে প্রথমে পুরুষ মনে হলেও পরে বোঝা যায় যে কথক প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদ। লেখকের বর্ণনা কৌশলে ব্রহ্মপুত্র নদকে জীবন্ত মানব চরিত্র বলে প্রতীয়মান হয়, যা লেখকের ব্যতিক্রমী শিল্প দক্ষতার পরিচায়ক।

অন্য গল্প 'যুদ্ধ নয়' যেখানে গল্প কথক একটি কুকুর। কুকুরের বয়ানে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শীভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুকুর 'জন' তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে এভাবে:

> **যুদ্ধ নয়, হয়তো আছে তার অন্য নাম, আমি জানি না। নতুন নাম? কেমন করে দিই, আমার কুকুরÓমগজ অনুর্বর। মাইনে্ষর মত তার ভাঁজে ভাঁজে নেই এত জটিলতা, এত প্যাঁচ বিশেষ। এখন আমি মরছি। আমার বুকের লোও গল্গল্ করে বেরিয়ে কালো করেছে অনেকখানি মাটি; এবং আমার চোখের আলো নিভছে, যদিও ধীরে ধীরে অতি ধীরে এক সময় ঠান্ডা হয়ে যাবো আমি চিরতরে এই ছোট্ট ডালিমমণিরই মতো যার তুলতুলে নরম পায়ের গোছাটা আমার জিভে এসে লেগেছে।**[৯]

'অসমাপ্ত', 'নীরবতা', 'যুদ্ধ নয়', 'চেতনার রং', 'রত্না আমি ও একটি কুকুর', উত্তম পুরুষে বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পে কথক কখনো উত্তম পুরুষে লেখক নিজেই। যেমন 'কাঠের নকশা', 'একটি কথার জন্ম', 'সুমার্-সিঁদুর', 'রোগমুক্তির ইতিবৃত্ত'। গল্পের বর্ণনায় বর্তমান থেকে অতীতে চলে যাওয়া বা অতীত স্মৃতি রোমন্থন করা গল্পকারের একটি বিশেষ প্রবণতা বলে পরিলক্ষিত হয়। এই পদ্ধতিকে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি গল্পের ঘটনাকে বর্তমান ও অতীতের সঙ্গে যৌক্তিকভাবে অন্বিত করে যা কাহিনির পূর্ণতা দানে সহায়তা করেছে। 'একটি সভ্যতা', 'চেহারা', 'আমার রক্ত', 'আমাকে একটি ফুল দাও', 'আঁতুড়ঘর', 'কাক' প্রভৃতি গল্পগুলোতে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটোগল্পগুলির আয়তন নাতিদীর্ঘ। গল্পগুলি সাত থেকে নয় বা দশ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুইটি গল্প দীর্ঘ আয়তন বিশিষ্ট: 'সামনে সাগর' গল্পটি পঁচিশ পৃষ্ঠা এবং 'শুধু ভালোবাসা' চৌদ্দ পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট। স্বল্প দৈর্ঘ্যের গল্প রয়েছে 'নোনা' যার দৈর্ঘ্য মাত্র তিন পৃষ্ঠা। আলোচ্য গল্পকার তাঁর গল্পে প্রকৃতির ব্যবহারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। শৈশবে পল্লীপ্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে বেড়ে ওঠা আলাউদ্দিনের মানসগঠনে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। গল্পকারসত্তার সঙ্গে কবিসত্তার উপস্থিতি বিভিন্ন গল্পে মূর্ত হয়ে ওঠে প্রকৃতির নানামুখী প্রাসঙ্গিক ব্যবহারে। তিনি ঘটনার আভাস দিতে ও চরিত্রের অন্তর্লোক উন্মোচনে প্রকৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির সুপরিকল্পিত বর্ণনা তাঁর শিল্প কুশলতার পরিচায়ক। বিশেষত মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়ের নানা মাত্রিক বর্ণনা, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমক, বজ্রপাত অনুষঙ্গের মাধ্যমে আসন্ন বিপদের আভাস আবার কখনো চরিত্রের মানসিক সঙ্কটকে সূচিত করা হয়েছে। 'আঁতুড়ঘর' গল্পে সলিমদ্দি ও রহমজানের জীবনে যে অপরিসীম বিপদের ঘনঘটা সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কাহিনির শুরুতেই বৈরী প্রকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে 'আজ সাড়াটা [সারাটা] বিকেল মেঘ করেছিল, সন্ধ্যার সামান্য পরেই ঝর্ঝর্ করে বৃষ্টি শুরু হলো। ঘন ঘন বিজলির চমক, আর থরথর মাটি কাঁপিয়ে আকাশের গম্ভীর গর্জন গভীর রাত্রির আসন্ন দুর্যোগকে নিশ্চিত করে তুলেছে। চারিদিকে গাঢ় কালো অন্ধকার।'[১০] অপর গল্প 'অপচ্ছায়া' যার সূচনাতেই প্রকৃতির বর্ণনা এরকম:

> **এমনি হচ্ছে রোজ রোজ। এই মেঘ, এই বৃষ্টি। তারপর মাঝে মাঝেই ঘোর বর্ষণ। একটানা, ঝরঝর, ঝমঝম। কারুর খেয়াল নয়, খামখেয়ালিও না। তবু সবকিছু যেমন ঘটছে, আজকাল যেন একটু ব্যতিক্রম। পহেলা আষাঢ়ে তেমন কালো মেঘও দেখা যায়নি, কেবল ছিল ধোঁয়াটে হালকা আস্তরণ অথচ এখন আকাশ ভাঙা বর্ষা, সামনে আরও বড় জোয়ারের পূর্বাভাস আসছে কি? নদ — নদীতে আবর্ত, সাগর উত্তাল, শ্রাবণে কি আসবে কেউ জানে না।**[১১]

গল্পটিতে ঘটনার পূবার্ভাস ও পরিণতির কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রকৃতির বর্ণনায় গল্পের জটিলতা ও অশুভ কিছুর আভাস পরিলক্ষিত হয়। গল্প পাঠে মধ্যবয়স্ক বোনজামাই কতৃর্ক স্ত্রীর ছোটোবোনকে শারীরিকভাবে ভোগ করার চেষ্টা দেখা যায়। ছোটোবোন চাঁদনির মানসিক সঙ্কট ও ভেতরের অস্থিরতা দুর্যোগপূর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে তুলনীয়। আবার মধ্যরাতে চাঁদনির ঘরে গিয়ে বোনজামাই ফরমান আলি তার অসৎ যৌনকামনা চরিতার্থ করার যে উদ্যোগ নেয় তাকেও বৈরী প্রকৃতির আবহে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে

© Santiniketan Sahityapath

গল্পের পরিণতিতে বড়বোন কাঁদনি দুশ্চরিত্র স্বামীকে যেভাবে কাঁচের বোতল দিয়ে ঘায়েল করে তা পূর্বে অনুমান করা কষ্টকর। কাজেই সূচনাতেই লেখক আভাস দিয়েছেন 'শ্রাবণে কি আসবে কেউ জানে না।'[১২]

সাহিত্যাঙ্গানে ভাষাবিন্যাস ও শব্দের যৌক্তিক সংস্থাপন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষা ও শব্দের যথার্থ প্রয়োগ বিষয় এবং বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে। অপরদিকে ভাষা ও শব্দের দুর্বল প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ যে-কোনো সাহিত্যিক কীর্তির সুন্দর, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও ব্যর্থ করে দিতে পারে। অর্থাৎ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য ছাড়া সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য, 'বক্তব্য এবং বাগভঙ্গি এ দুয়ে মিলে সাহিত্য। বক্তব্য যখন ভুল প্রমাণিত হয়, সার্থক বাগভঙ্গি তখনও ভাষার ভাণ্ডারে সম্পদ হয়ে থাকে।'[১৩] বর্ণনা অংশ ও সংলাপ সংস্থাপন উভয় ক্ষেত্রে গল্পকার অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বাহুল্যবর্জিত কিন্তু লক্ষ্যভেদী বর্ণনাভঙ্গি তাঁর বৈশিষ্ট্য। তবে উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় বা চরিত্রের অবস্থা অনুধাবনের জন্য গল্পকার পরিমিত বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গল্পের বর্ণনা অংশে লেখক বাংলা ভাষার প্রমিত চলিত রূপ ব্যবহার করেছেন। সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাষা গল্পের বক্তব্য প্রকাশে ও অনুধাবনে সহায়ক হয়েছে।

সংলাপ চয়নের ক্ষেত্রে আজাদ অত্যন্ত জীবনমুখী ও সতর্ক ছিলেন। কোনো কৃত্রিমতাপূর্ণ বা আরোপিত সংলাপ তিনি সচেতনভাবে বর্জন করেছেন। গ্রামীণ চরিত্রে গ্রামের মানুষের উপযোগী সংলাপ, শিক্ষিত ও শহুরে চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ও ইংরেজি শব্দের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। আবার সমাজের বিত্তহীন শ্রেণির ভাষার সঙ্গে মধ্যবিত্তের ভাষার পার্থক্য রয়েছে। একই রকমভাবে উচ্চবিত্তের জীবনাচরণ ও ভাষার সঙ্গেও অন্যান্য শ্রেণির ভাষার কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আবার নারী ও পুরুষের ভাষা প্রয়োগের মধ্যে নিজস্বতা রয়েছে। একই ভাষার এই পার্থক্যটা অনেক বেশি না হলেও গৌণ নয়, গল্পকারের নিবিড় পরিচর্যায় তা ধরা পড়েছে। চরিত্রের সংলাপে উর্দু, আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার তার সমাজসংলগ্নতাকে নির্দেশ করে। আজাদের আটটি মৌলিক গল্পগ্রন্থের মধ্যে প্রথম ছয়টি গ্রন্থের রচনাকাল পাকিস্তান শাসনামলে। সপ্তম গ্রন্থ 'আমার রক্ত স্বপ্ন আমার' গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭৫ সাল হলেও অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির রচনাকাল মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনকালীন। তৎকালীন শাসকদের উর্দু ভাষা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদিত ভাষা হওয়ার কারণে এর চর্চা সর্বত্র প্রচলিত ছিল। তাই গল্পের সংলাপে উর্দু শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার তৎকালীন সমাজ বাস্তবতারই প্রতিফলন। উদাহরণ: 'একটি সভ্যতা' গল্পে রাজমিস্ত্রিদের সর্দার ও তার পাঞ্জাবি দোস্তর কথোপকথন: একদিন বিরাট দাড়িওয়ালা একটা লোক আমার কাঁধে হাত রেখে জিগগেস করলে, ইয়ে কোন হ্যায়? বাবা হেসে জবাব দিলেন, আল্লাকা মাল, ব্যাটা। তব্ তো মেরা দোস্ত? ঠিক হ্যায়।... ইয়ে আদমি নোকরি চাহতা থা। ['একটি সভ্যতা', জেগে আছি, পৃ. ১১] পাকিস্তান শাসনামলে উর্দুর পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলন ছিল। সংলাপের ক্ষেত্রে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার চরিত্রকে তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে প্রকাশ করেছে। উদাহরণ: 'মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন, বেরাদানে ওয়াকিবহাল। কিতাবে আছে, খোদার গজব নামে তখনি যখন দুনিয়া গুনাগারিতে ভরে যায়।' ['বৃষ্টি', 'স্বনির্বাচিত ছোটগল্প', পৃ. ১৪৭]

গল্পকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড গমন করেন। এছাড়াও কর্মসূত্রে অনেক দেশে অবস্থান করার সুযোগ ঘটে। ফলে তিনি ইংরেজি ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাই গল্পে শিক্ষিত চরিত্র ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সংলাপে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উদাহরণ: 'অসুখটা খুব সিরিয়াস নাকি?... গেসটিক আলসার।... এর একমাত্র রেমিডি হচ্ছে অপারেশন।' ['কয়েকটি কমলালেবু', জেগে আছি, পৃ. ৫১]

গল্পের চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের ব্যবহার চরিত্রকে বাস্তবানুগ ও জীবন্ত করে তোলে। তিনি গল্পের চরিত্র যে শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে তার মুখে সেই শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী সংলাপের ব্যবহার করেছেন। সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ আর সচ্ছল, ধনী ব্যক্তির ভাষা কখনো এক নয়। আবার গ্রাম্য ও শহুরে ব্যক্তির সংলাপে যেমন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তেমনি অঞ্চলভেদেও ভাষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষযোগ্য। পেশা বা বৃত্তি ভেদেও ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায়। আলাউদ্দিন আল আজাদ একজন সূক্ষ্মদর্শীর সাহিত্যিক যিনি সমাজ ও সমাজমধ্যগত

© Santiniketan Sahityapath

মানুষকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই প্রতিটি চরিত্রের সংলাপের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার তাঁর ছোটোগল্পকে প্রাকরণিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে:

প্রফেসরের সংলাপ: 'আই ডু এপ্রিসিয়েট ইউর ফিলিং মাই বয়েজ।' ['সামনে সাগর', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ১৯৭]

স্টেশন মাস্টারের সংলাপ: 'অল্ আর ব্লাডি নন্সেন্স। না চেয়েই জবাব দেন স্টেশন মাস্টার।' ['ফেরার', 'জেগে আছি', পৃ. ১০৬]

চা-বিক্রেতার ভাষা: 'কাঁচের গেলাসগুলো টেবিলে সাজিয়ে বলে উঠলো, উল্লুকটা কয় কি শুনছো? কয় বাড়ি নেই। বাড়ি নেই আবার কি রে? বাড়ি থাকে শেয়ালের, বাড়ি থাকে কুত্তারও। আর তুই তো আদম।' ['একটি কথার জন্ম', জেগে আছি, পৃ. ১৫৯]

কৃষকের সংলাপ: 'আর কয়টা দিন সবুর কর, খেতের ধান পাকলো বইলা। তখন আমরার দুক্খু থাকব না।' ['শিষ ফোটার গান', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৫৪–৫৫]

মুক্তিযোদ্ধার সংলাপ: 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে মিলি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। এ তো আমাদের গৌরব। শুনতে পেলাম, যে-কোনো মুহূর্তে ওরা আমাদের নিরস্ত্র করবে। ইয়াহিয়ার আলোচনা বৈঠক একটা ধাপ্পাবাজী। প্রতিদিন শত শত সৈন্য আসছে প্লেনে করে। আসছে অস্ত্রশস্ত্র। আমরা বুঝেছি ওরা ছাড়বে না। আমরাও প্রস্তুত। কেবল ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায়।' ['জলনাঙ্ক', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৩৮৮]

রাজাকারের সংলাপ: 'চাষাভুষার আবার স্বাধীনতা কি। কেচোর মতন মাটি আঁকড়ে থাকবে, এটাই ওদের নিয়ম। আসল জায়গায় চালান কইরা দিলাম হাহা হাহা! হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক। আরেকজন স্ফূর্তির সঙ্গো মন্তব্য করে, যুদ্ধের সময় পালিয়ে ছিলাম, যুদ্ধের পরে আমরা বীর। স্বাধীনতার ফল আমরাই তো ভোগ করবো। হোহোহোহো!' ['চাষাভুষা', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৩০৪]

সৎ রাজনৈতিক কর্মীর ভাষা: 'আচ্ছা এমন যদি হত এটা আমাদের গ্রাম, আর খেতগুলি যেন আমাদের দাদনচকের! আর মানুষগুলি আমরা, সারা গাঁয়ের বাসিন্দা। এখানে, গ্রাম কারো একার নয়, ফসল কারো একার নয়, আমাদের সবার। সবাই মিলে কলে চাষ করি, ভাল সার বীজ ফেলি, আর মওসুম শেষে সোনার মতো ফসল সবাই ভাগ করে নিই। সুখে-দুঃখে সবাই মিলেমিশে বাস করি, তাহলে কেমন হত?' ['বাতি', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৭২]

শহরের শিক্ষিত মানুষের ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার কম আর গ্রামের মানুষের ভাষায় আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে প্রাচুর্য ও প্রমিত বাংলা ভাষার অনুপস্থিতি স্বাভাবিক। গ্রামের অল্প শিক্ষিত মানুষের সংলাপ: 'আসগর ভাই ব্যবসা শুরু করছে, অহন ট্যাহাপইসা অইব। আর হুনছো? কুলসুম বুবুর

কী? কী রে? জলদি কস্ না?

কি আর! কুলসুম বুবুর বাচ্চা অইব!' ['বখশিশ', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৩৯৬]

অঞ্চলভেদে ভাষার তারতম্য ঘটে থাকে। কখনো এই প্রভেদ কম হয় আবার অনেক অঞ্চলের ভাষা কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হয়।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সংলাপের উদাহরণ: 'ওগ্গা কিছু দেখনা ওডা ইয়াছিন। এগুণ হুনতে হুনতে আঁর তে আর গম ন লাগে।' ['নোনা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ১৪৯]

চাবাগানের কুলির ভাষা: 'মুই সাত নম্বরে থাকতে লারবো হুজুর। মুকে কারখানায় দ্যান।' ['ধোঁয়া', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ১৮৮]

নারী পুরুষ একই বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও নারীর ভাষা ব্যবহারে পুরুষদের চেয়ে কোনো কোনো সময় স্বতন্ত্র একটা প্রবণতা প্রকাশ পায়। কখনো শব্দ ব্যবহারে, আবার ভাবের প্রকাশের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য মূর্ত হয়ে ওঠে। এই পার্থক্যের পেছনে সমাজতাত্ত্বিক কারণ রয়েছে, আরো আছে নারীর লিঙ্গগত পার্থক্যজনিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিকতা। উদাহরণ:

অসহায় প্রেমিকার সংলাপ: 'আমি আর এই বাড়িতে টিকতে পারছিনা। একটু থেমে সে বলেছিল, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।' ['এক হাজার এক রাত্রি', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৭৭]

নববিবাহিতা স্ত্রীর সংলাপ: 'তুমি আমাকে সব দিয়েছ। রেজিনা বলেছে, এখন যদি চোখ বুঁজে মরেও যাই, তবু আমার জীবন সার্থক। পুতুল ছিলাম। তোমার হাতে প্রাণ পেয়েছি, এখনো সে প্রাণ তোমারই হাতে।' ['পুনর্মিলন', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ১০৫]

© Santiniketan Sahityapath

ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তিনি খুব মনোযোগ সহকারে তাদের ভাষাভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করেছেন। দরিদ্র পরিবারের ক্ষুধার্ত বাচ্চার সংলাপ: 'আমাল বল ভুক লাগছে।' ['কুপি', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৩৬৭]

সংলাপ সংক্ষিপ্ত। তবে মাঝে মাঝে দীর্ঘ বাক্য দেখা যায়। ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ চরিত্রের অন্তর্জগৎ সম্পর্কে পাঠকের মনে বিশেষ প্রতীতির আভাস দেয়। যেমন 'একটি কথার জন্ম' গল্পে কালুর উক্তি, 'যেখান থেকেই তাড়াও না কেন, জেনে রাখ জায়গা আমাদের কখনো ফুরাবে না'। ['একটি কথার জন্ম', 'জেগে আছি', পৃ. ১৬৭]

এই বক্তব্য শুধু কালুর নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী সকল আদর্শ রাজনৈতিক কর্মীর চেতনায় ধারণ করা বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। সংক্ষিপ্ত সংলাপের উদাহরণ:

কে? ও উঠে বসলো বিছানায়, আব্বা!

হু।

এতোরাত্রে। ঘুমোননি?

না। ['ছুরি', জেগে আছি, পৃ. ১২৪]

দীর্ঘ সংলাপ খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ: 'আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাকে তালাক দিতে চাই নাই। ঘরে চাল ছিলনা, বারবার পীড়াপিড়ি করতে ছিল, আমার মাথা চউড়া গেছিল।' ['সুর্মাআঁকা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৬৭]

সংলাপ সাধারণত সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্য বর্জিত হলেও বর্ণনা অংশে ডিটেলসের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষত গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাঠকের মনে এক ধরণের দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুভূতির সৃষ্টি করে। ফলে পাঠক সহজেই গল্পের পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। বাক্যের অর্থকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য গল্পকার প্রচুর দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন: 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকি আমি।' ['একটি সভ্যতা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ.২৪]

বাংলা বাগ্‌ভঙ্গির অপরিহার্য উপাদান প্রবাদ ও প্রবচন। এগুলো বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে প্রবাদ প্রবচনের বহুল ব্যবহার প্রচলিত। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সারবত্তা একটি সর্বজনীন ভাবসত্য হিসেবে প্রবাদ প্রবচনে বিধৃত থাকে। জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও ব্যবহারিক জ্ঞান, লোকসমাজে দৃঢ়মূল নানা অভিব্যক্তি ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে। ছোটোগল্পে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার আজাদের কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় ভাষাকে আরো বেগবান ও অর্থবহ করে তুলেছে। জেগে আছি গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কাঠের নকশা' পরবর্তী সময়ে গল্পকার কর্তৃক পরিবর্তিত নাম 'একটি সভ্যতা' গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদের ব্যবহার 'নিজে বাচঁলে বাপের নাম'। অন্য গল্পেও প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন:

'কথায় বলে উপকারীকে বাঘে খায়।' ['সৃষ্টি', 'জেগে আছি', পৃ. ৪৬]

'তেলে আর জলে কোনদিন মিশ খায় না।' ['শিকড়', 'জেগে আছি', পৃ. ১৪৩]

প্রবাদ-প্রবচনের যৌক্তিক ব্যবহার লেখকের ভাষা সম্পর্কিত গভীর বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর বহন করেছে। সংলাপে প্রবাদের ব্যবহার ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে। প্রবাদ-প্রবচনের পাশাপাশি প্রচুর বাগধারার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উদাহরণ: 'বুঝেছি, তুই এখন রাঘব বোয়াল বড় বড় রুই কাতলাদের নিয়ে কারবার্ আমাদের মত চুনোপুঁটির কথা মনে থাকবে কেন?' ['পাংগাস', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৩৮১] ব্যঙ্গা বিদ্রূপাত্মক বাক্যের উপস্থিতি গল্পের ভাষাকে শাণিত করার পাশাপাশি বক্তব্যকেও বলিষ্ঠ করে। আজাদের ছোটোগল্পে ব্যঙ্গা বিদ্রুপাত্মক বাক্যের ব্যবহার গল্পের বক্তব্যকে ইঙ্গিতময় ও ধারালো করেছে। যেমন: 'কোন বড়ো অফিসারের আত্মীয় আমি নই, তাই এত বড়ো কপাল থাকতেও কাজ কিংবা চাকরি কিছুই জুটে উঠল না।' ['একটি কথার জন্ম', 'জেগে আছি', পৃ. ১৫৮]

© Santiniketan Sahityapath

'অলঙ্কার' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিভূষিতকরণ বা সুসজ্জিতকরণ। অলংকার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য বর্ধন করা। শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয় প্রকার অলংকারের প্রয়োগে আজাদ তাঁর ছোটোগল্পের ভাষিক সৌন্দর্য ও অর্থের দ্যোতনার শৈল্পিক উৎকর্ষ সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন। অলংকারের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁর ভাষা সম্পর্কিত অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শব্দালংকারের উদাহরণ: অনুপ্রাস: সমালোচকের মতে 'বর্ণ (ধ্বনি) বা ধ্বনিগুচ্ছ যদি যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বাক্যমধ্যে একাধিকবার ধ্বনিত হয় তবে তাকে অনুপ্রাস বলা যায়।'[১৩] তবে অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি বিবেচিত হয় না।

'গোলা ভরা ধান ছিলো না, গলায় গান ছিলো'। ['শিকড়', জেগে আছি, পৃ. ১৩৬]

'পরনে বহু পুরনো একটি দিশি কাপড়।' ['সুন্দরী, সুন্দরী', জেগে আছি, পৃ. ৬৮]

শ্লেষ: 'একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার করেও কবি যদি তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হন এবং পাঠক — সাধারণ একাধিক অর্থেই তাকে গ্রহণ করেন তখন তাকে শ্লেষ বা শব্দ — শ্লেষ অলঙ্কার বলা যায়।'[১৪] লেখক বিশেষ অর্থবহ শব্দ একটি বাক্যে একবারই ব্যবহার করলেও বিশেষ শব্দটির একাধিক অর্থ থাকায় এবং লেখকের চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগের ফলে শ্রোতার কাছে বাক্যটির একাধিক অর্থ প্রতিভাত হয়।

'সবকিছুই শুধু অর্থ।' ['টেবিল ঘড়ি', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৫৩]

'সুরুজ উঠতাছে মণি, সুরুজ!' ['শিষ ফোটার গান', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৫৯]

'রাতের বেলা না চললে সকালকে পাওয়া যায় না।' ['বাতি', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৭৪]

বক্রোক্তি: বক্রোক্তি শব্দালঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত। বক্তা যখন কোনো কথাকে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেন কিন্তু শ্রোতা কথাটিকে সেভাবে গ্রহণ না করে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেন এবং সেই অনুসারেই জবাব দেন তবে সেখানে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।[১৫] উদাহরণ: 'তার মহানুভবতার কথা সবাই জানে।' ['শিকড়', জেগে আছি, পৃ. ১৩৯]

অর্থালঙ্কারের বিশেষত উপমার ব্যবহার আজাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলা যায়। উপমা অর্থাৎ তুলনার মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় ফলে বিষয়বস্তু অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, চিত্রকল্পের যথার্থ ব্যবহার শিল্পীর শিল্পদক্ষতার পরিচায়ক। আজাদের প্রতিটি গল্পে প্রচুর উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপমা: উপমাকে সমালোচক এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'একই বাক্যে স্বভাবধর্ম বিজাতীয় দুটো বস্তুর বিসদৃশ্য কোনো ধর্মের উল্লেখ না করে যদি বিশেষ গুণে, বা অবস্থায় অথবা ক্রিয়ায় বস্তু দুটোর সাদৃশ্য দেখানো হয় তাহলে তাকে উপমা অলঙ্কার বলা হয়।'[১৬] উদাহরণ:
'মাঝে মাঝে তো ছুরির ফলার মত শাণিত কণ্ঠস্বর। ['কুপি', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ৩৬৩]
'সকালের দিকে ইস্টিশনের বাতিগুলো ভূতের চোখের মতো জ্বলে।' ['কয়লা কুড়ানো দল', 'জেগে আছি', পৃ. ২৪]
'পিঁপড়ার ঝাঁকের মতো ভেঙ্গো যায় সমাবেশ।' ['জমাখরচ', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ১৯০]
'আমার দিকে ওর প্রস্ফুটিত মুখ, সূর্যমুখীর মতো।' ['রত্না আমি ও একটি কুকুর', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ.২৭৪]
উৎপ্রেক্ষা: সমালোচকের ভাষায় 'প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে মনে হয় তা'হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হবে।'[১৭] উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি হয় উপমেয় সম্পর্কে। 'পিটপিটে চোখ, নাকটা পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে আবার একটু বেঁকে গেছে নিচের দিকে, তার ছিদ্র যেন একজোড়া বেজীর গর্ত।' ['কাঠের নক্শা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ১৮]
'রাত্রির বৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন মুক্তিস্নান করিয়ে গেছে। রাস্তায় ধুলো নেই। তকতকে পরিষ্কার। সমস্ত শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে, রাস্তাগুলো যেন তার রক্তবাহী শিরা।' ['অসমাপ্ত', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ১২]
রূপক: সমালোচকের মতে 'উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হইলে রূপক অলঙ্কার হয়।।'[১৮] অভেদ কল্পনা করা হলেও উপমান ও উপমেয় উভয়ই বাক্যে উপস্থিত থাকে। উদাহরণ: 'সারাটা এলাকা আঁধারের চাদরে মোড়ানো বৈকি, কিন্তু কোন কোন বাড়িতে বাতি আছে।' ['মুখোশ', স্বনির্বাচিত গল্প, পৃ. ৪০২]

সন্দেহ: 'যেখানে উপমেয় ও উপমান উভয়পক্ষে সমান সংশয় থাকে, সেখানে সন্দেহ অলঙ্কার হয়।'[১৯] যেখানে উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি হয় উপমেয় সম্পর্কে সেখানে সন্দেহ অলঙ্কারের ক্ষেত্রে উপমান ও উপমেয় উভয় ক্ষেত্রেই।

'সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে যেন ক্রমান্বয়ে উঠছে ধুম্রকার মেঘ রাশি, কিন্তু সেকি সুড়ঙ্গা, না কারো বিদীর্ণ হৃদয়?' ['তাম্রলিপ্ত', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৩০৪]

চিত্রকল্প: চিত্রকল্প কোনো বিশেষ অলঙ্কারের অন্তর্ভূক্ত না হয়েও উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-প্রতীককে ধারণ করে এবং সাহিত্যকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। সমালোচকের ভাষায়, 'কবিতায় বর্ণিত যে-চিত্র তার দৃশ্যের সঙ্গে একটি ভাবনাকে যুক্ত করে দৃশ্যাতিরেক সৌন্দর্য দান করে, পাঠককে দৃশ্যের বাইরেও অন্য কিছু ভাবতে প্রলুব্ধ করে, চেতনাকে সম্প্রসারিত করে তাকেই 'চিত্রকল্প' বলে গণ্য করা হয়।'[২০] চিত্রকল্পে চিত্রের আভাস ব্যঞ্জিত হলেও এর সীমা দৃষ্টিগ্রাহ্য অর্থকে অতিক্রম করে শ্রবণগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য ও ঘ্রাণগ্রাহ্য বিষয়গুলিকেও অঙ্গীভূত করে।

'বিকেলের রাঙা আলোয় সন্ধ্যা আশ্চর্য সুন্দর হয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে দেয় বাসর রাত্রে নববধূর সলাজ মুখের মতো'। ['একটি কথার জন্ম', 'জেগে আছি', পৃ. ১৬১]

জনগণের দীর্ঘদিনের জীবনাচরণের সঙ্গে লোকজ সংস্কার ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা না গেলেও এর আবেদন মানুষের হৃদয়ে ও অন্ধবিশ্বাসে। শুধু অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নয় শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও লোকজ সংস্কারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই বিশ্বাসের ভিত্তি মানুষের আদিম জীবনচর্চার সঙ্গে মিশে আছে। আজাদ সমাজে প্রচলিত সংস্কারগুলি গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ:

> 'আর কি আছে দিন। বাসনটা চেটেপুটে খেয়ে ও বলল। মা শঙ্কিত হলেন। খাচ্ছে, এ সুখের কথা। কিন্তু এভাবে খাওয়াটা খুব ভালো নয়। এই মাথা নিচু করে, কোনদিকে না চেয়ে গোগ্রাসে গেলা। তিনি জানেন, এভাবে যারা খায়, তারা বাঁচে না বেশিদিন।' ['জলটুঙ্গি', 'স্বনিবার্চিত গল্প', পৃ. ১১৪-১১৫]
>
> 'সাত বছর একফোঁটা চোখের পানি ফেলিনি তোর অমঙ্গাল হবে বলে।' ['পুনর্মিলন', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ১০৪]

লেখক পরিস্থিতি সহজে বোধগম্য ও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য করতে ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন: টলটলে, ফুরফুরে, টুংটাং, থপ্ থপ্, ঢিপ্ ঢিপ্, ধড়মড়, খচর্ খচর, সপাংসপাং, ঝিকমিক, ফিটফাট, ফট্ফট্, গুড়গুড়, ঝিমঝিম, গুন্গুন্, ঝিণ্‌ঝিণ্, ঝর্ঝর, ধুক্পুক্, খর্খর্, হন্হন, মিটি্ মিট্, কিচিরমিচির, ঠক ঠকি, ঝিমি্ঝম, হুড়োহুড়ি, সরসর, কিচিরমিচির, খ্যাক্খ্যাক্, ঝম্ঝম, ধুড়মুড়, টপ্টপ্, তক্তক্ ইত্যাদি।

বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিশেষণের ব্যবহার করেছেন। যেমন: দুষ্ট ছেলে, বড় বড় থাম, ধূসর কাঠিন্য, আবছা অন্ধকার, নরম আলো, ভালো ছেলে, ভেজা বেড়াল, খুৎখুতে বুড়োটা, আধো-আলগা খোঁপা, উদাম গতর, ভেজা গলায়, খসখসে চুল, ঝলমলে আকাশ প্রভৃতি।

যখন কোনো বক্তব্য সরাসরি প্রকাশ না করে আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে অথবা অন্য কোনো কিছুকে আশ্রয় করে মূল বক্তব্যকে আড়াল করা হয় তখন তাকে প্রতীক বলা হয়। 'ব্যবহৃত শব্দ যখন তার সহজ সাধারণ আক্ষরিক অর্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর অর্থের ইঙ্গিত দেয় তখনই সাহিত্যের পরিভাষায় বলা হয় যে শব্দটি প্রতীকী।'[২১] সাধারণত কোনো শব্দের মাধ্যমে বিশেষ কোনো ভাবকে ধারণ করা হয় প্রতীকী গল্পে। আবার কখনো কোনো শব্দ বিশেষ তাৎপর্যের ধারক হয়ে ওঠে। যেমন 'পাংগাস' গল্পে পাংগাস শব্দটি আপাতভাবে একটি মাছের নাম হলেও এর অন্য একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সরকারি অফিসে অলিখিত ঘুষের যে অবাধ প্রচলন সেই বিষয়টি লেখক সরাসরি প্রকাশ না করে পাংগাসের প্রতীকে ব্যবহার করেছেন। বড়ো বড়ো পাংগাসের ভাগ সরকারি অফিসের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ে কর্মরত সবাই ক্রম অনুসারে পেয়ে থাকে। গল্পের শেষে দেখা যায় এইরকম পাংগাস বাংলাদেশকে গিলে ফেলছে। কিন্তু প্রতিরোধ করার উপায় নেই। গল্পে পাংগাসের সর্বগ্রাসী রূপকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, 'বিছানায় ধরে নিয়ে শুইয়ে

© Santiniketan Sahityapath

দিলে চেতন-অচেতনের মধ্যে একসময় তার অস্পষ্ট স্মৃতিতে ভাসল আদিগন্ত একটা বিশাল পাংগাস মাছ, করাতের মত দাঁত বার করে ওঁচানো পুচ্ছ নেড়ে নেড়ে বঙ্গোপসাগর থেকে হুমড়ি মেরে এবড়োখেবড়ো রুটির মতো বাংলাদেশটাকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে এবং সবটাই গিলে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'[২২] আজাদের শ্রেণিসচেতনতা মূলক গল্পে কাস্তে শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কাস্তে কৃষকদের পরিশ্রম করে বাঁচার হাতিয়ার। এই কাস্তে আবার তাদের সংগ্রাম ও প্রতিবাদের হাতিয়ার। তাই বিভিন্ন গল্পে লেখক কাস্তেকে এভাবে উল্লেখ করেছেন: 'ছেঁড়া কাঁথাগুলো পুটলি-মত বেঁধে গামছার আগায় ঠেকায়, পুরনো কাস্তের জং ফেলে গুঁজে রাখে পুটলির ভিতরে।' ['মুখোমুখি', 'জেগে আছি', পৃ. ৮৬]

'তার হাতে কাস্তের গন্ধ, পায়ের নিচে সোঁদালো মাটির অনন্ত আদর, প্রত্যেকটা ধানগাছ তার লোমশবুকের শ্রাবণনদীস্নেহে বেড়ে উঠেছে, সেখানে কোথায় বর্গাদার?' ['শিষ ফোটার গান', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৫৫]

বেশ কিছু গল্পে 'সূর্য' শব্দটি সংগ্রামী মানুষের আশার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ: 'আগুন জ্বলছে, জ্বলতে থাকে আগুন।' ['শিষ ফোটার গান', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৪৩]

আজাদের গল্পে সাপ শব্দটিও অনেকবার এসেছে যা যৌন আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক হিসাবে লেখক উল্লেখ করেছেন। 'বৃষ্টি' গল্পে বৃষ্টি শব্দটি প্রজনন বা নতুন প্রাণের সঞ্চার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। লোকজ শব্দের ব্যবহার সংলাপ ও বর্ণনাকে গ্রামীণ আমেজ এবং আবহ প্রকাশে সহায়তা করেছে। উদাহরণ: 'গামছাটা উদাম গতরে জড়িয়ে মজিদ বসে থাকে শিয়রে।' ['শিষ ফোটার গান', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৫৫]

'ছোটো মুচিতে কিছু সরিষার তেল আর টাকটা হাতে নিয়ে উঠোনে নেমে গেল দুধ দুইতে।' ['ধানকন্যা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', পৃ. ৭৭]

চেতনাপ্রবাহ রীতির ব্যবহারে কোনো কোনো গল্পের চরিত্রের অন্তর্জগৎকে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। যেমন, 'এক হাজার এক রাত্রি', 'ছেঁড়াকোট', 'চেতনার রং' গল্পে এই প্রবণতা দেখা যায়। চেতনা প্রবাহরীতি ব্যবহারের উদাহরণ: 'আজকের আশরাফ আর সেদিনের আশরাফে কত তফাৎ। একজনের মৃত্যু হয়েছে, আরেকজন জন্ম নিয়েছে। অথবা একজনের মৃত্যুর পর তার প্রেতাত্মা লোকালয়ের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর কোনটা ঠিক, আমি বুঝতে পারি না।' ['ছেঁড়াকোট', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', ৮৯]

সমালোচকের ভাষায় 'সুনির্বাচিত, ইঙ্গিতবহ শব্দ ; ভাবময়, স্বতঃস্ফূর্ত বাক্যবিন্যাস; বিষয়োপযোগী নির্ভুল ভঙ্গী; বাহুল্যহীন অথচ অভ্রান্ত শৈলী এ সবেরই সার্থক সমাহারে ছোটগল্প লাভ করে তার স্বল্পায়তন বাহ্য অবয়ব আর অব্যর্থ স্বরূপ।'[২৩] আলাউদ্দিন আল আজাদের অধিকাংশ ছোটোগল্পের বিশ্লেষণে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাঁর ছোটোগল্পের বক্তব্য স্পষ্ট ও অনাবশ্যক জটিলতামুক্ত। জীবনঘনিষ্ঠ সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি পাঠকের হৃদয় ও মনন স্পর্শ করে। জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনি, সমাজের বহু বিচিত্র বিশেষত সংগ্রামী ও আত্মসচেতন চরিত্র নির্মাণ, সহজ সরল আলঙ্কারিক ভাষা এবং কাব্যিক আবহ তাঁর ছোটোগল্পে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। যথার্থ শব্দ, চরিত্রানুযায়ী সংলাপের ব্যবহার, প্রবাদ প্রবচনের দক্ষ ব্যবহার, বর্ণনা অংশে লেখকের ব্যক্তিত্বপূর্ণ সংযম তাঁর ছোটোগল্পকে শুধু শিল্পোত্তীর্ণই করেনি বরং বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান তৈরি করেছে।

তথ্যসূত্র:

১। 'সাহিত্য সমালোচনা ইতিবৃত্ত ও পরিপ্রেক্ষিত', আলাউদ্দিন আল আজাদ, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ জুন ২০০৫, পৃ. ৪৫

২। 'বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য', আজহার ইসলাম, অনন্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুআরি ২০১৪, পৃ. ২১৯

৩। 'আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন ও সাহিত্য', 'আমার প্রথম বই', সম্পাদক সিকদার আবুল বাশার, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা অক্টোবর, ২০০৩, পৃ. ১৪৮

৪। ' শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', 'চারগুণ্ডা', আলাউদ্দিন আল আজাদ, গতিধারা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬৩

৫। ওই, 'চিহ্ন', শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প, পৃ. ১৫৭

© Santiniketan Sahityapath

৬। 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'রত্না আমি ও একটি কুকুর', আলাউদ্দিন আল আজাদ, গতিধারা, ঢাকা, ২০০২,পৃ. ২৭২
৭। ওই, 'স্বনির্বাচিত ছোটগল্প', 'সমতল', পৃ. ১৯৯
৮। ওই, 'নীরবতা', পৃ. ২৩৮
৯। ওই, 'যুদ্ধ নয়', 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', পৃ. ২৬০
১০। ওই, 'আঁতুড়ঘর', পৃ. ৯৪
১১। ওই, 'স্বনির্বাচিত ছোটগল্প', 'অপচ্ছায়া', পৃ. ৩৭৮
১২। ওই, পৃ. ৩৭৮
১৩। 'বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা', 'ভাষার সাধনা', অম্লান দত্ত, সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ, সমতট প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৬
১৪। 'অলঙ্কার অন্বেষা', নরেন বিশ্বাস, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৪২
১৫। ওই, পৃ. ৫৬
১৬। 'বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার', অজয়কুমার চক্রবর্তী, বনলতা আর্ট প্রিন্টার্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৫৯, পৃ. ১০০
১৭। ওই, পৃ. ১০৮
১৮। বাঙলা অলঙ্কার, জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কলকাতা মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৮, পৃ. ২২
১৯। ওই, পৃ. ৩২
২০। 'চিত্রকল্প ও বিচিত্র গদ্য', আবিদ আনোয়ার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১১
২১। ওই, পৃ. ১৩৮
২২। ওই, 'শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প', 'পাংগাশ', পৃ. ৩৮৫
২৩। 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা, ৩য় সং, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২০৬

© Santiniketan Sahityapath